Bengal Scholar

আমাদের ওয়েবসাইটে সরকারী, বেসরকারী এবং প্রাইভেট স্কলারশিপ নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের পদ্ধতি, পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি সহ বিভিন্ন তথ্য সঠিক সময়ে প্রদান করা হয়।

ভূমিকা

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে,

করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে

দিন যে, দীনের বন্ধু।

বাংলার ভূমিতে অনেক মহাপুরুষ ও সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার প্রকৃত নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এছাড়া তিনি সর্বদা দারিদ্র্যের সাহায্য করতেন, তাই অনেকে তাকে "দয়ার সাগর" নামেও চিনত।রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“আমাদের এই মানুষের সমাজে দেবতার চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর।” সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করে নবজীবনের স্রোতধারায় চালিত করার গুরুভার তিনি মাথায় নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যেন কর্তব্যে বজ্রের চেয়েও কঠোর, আবার স্নেহ মমতায় কুসুমের চেয়ে কোমল—“বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি।”

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ভগবতী দেবী। অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবন কাটে।

ছাত্রজীবন

আট বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে তিনি বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসেন। আসার পথে মাইলস্টোন দেখে তিনি ইংরেজি এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা শিখেছিলেন। ছোটোবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র খুব দুরন্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও মেধাবী

ছাত্র। তাঁর বাবা সামান্য বেতনে সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই বাজার, রান্না ও অন্যান্য কাজ করতেন। এভাবে পড়াশোনা করেও তিনি প্রতিবছর পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।

কর্মজীবন

বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কাজ করেন। কালক্রমে তিনি ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন। সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার দরুন তিনি ওই চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর তিনি ছাত্রদের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন এবং এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি 'বর্ণপরিচয়' থেকে শুরু করে অনেকগুলি বাংলা বই লিখেছেন। তিনি বাংলা গদ্যে দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি যতিচিহ্ন প্রবর্তন করেন। এজন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য কলকাতায় এবং নিজের গ্রামে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

খাটো মাপের ধুতি, চাদর ও চটি পরিহিত এই মানুষটি জীবনের যে-কোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী পুরুষ। কিন্তু কারও দুঃখ দেখলেই তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। তাঁর মন ছিল ফুলের মতো কোমল। অনেক গরিব ছাত্র তাঁর সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি যা ভালো মনে করতেন, তা করতে মোটেই ভয় পেতেন না। মায়ের প্রতি বিদ্যাসাগরের অসীম ভক্তি ছিল। একবার মায়ের ডাকে বাড়ি যাওয়ার পথে নৌকা না পাওয়ায় তিনি দামোদর নদ সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন।

সমাজকল্যাণমূলক কাজ

আঠারোশো শতকের সমাজে প্রচলিত কু প্রথা নিবারণ ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সেই সময় যেসব প্রথা গুলির কারণে সমাজ বিকশিত হতে পারছিল না, সেগুলো তিনি চিহ্নিত করে পরিবর্তন ও সংস্কারে উদ্যোগী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, নারীদের শিক্ষা ও তাদের যোগ্য সম্মান না দিলে সমাজের উন্নতি হবে না। এই কারণে, পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৪ সালের মধ্যে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮৮টি।এছাড়া তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে গিয়ে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে সেই সময়কার ব্রিটিশ সরকার বিদ্যাসাগরের দ্বারা তৈরি বিদ্যালয়গুলির দায়ভার গ্রহণ করে, যার ফলে স্কুলগুলো ভালোভাবে চালু থাকে। সেই সময় সমস্ত বিদ্যালয় মিলে প্রায় ১৩০০ ছাত্রী পড়াশোনা করত। শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে তিনি

সেই সময় বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্যও উদ্যোগী হন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

বিদ্যাসাগরের জনসেবা ও দানের বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বিধবাদের করুন দশা দেখে তিনি পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করে শাস্ত্র অনুসারে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেন। তাঁর মহৎ প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ সালে সমাজে বিধবাবিবাহের আইন পাশ হয়। বিদ্যাসাগরের এই সমস্ত অবদান সমাজের উন্নয়নে এক বিশাল মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তাঁর কাজগুলি আমাদের দেশের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিধবা বিবাহ প্রথা

ভারতে প্রথম বিধবা পুনর্বিবাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও এর সামাজিক উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লেখালেখি এবং প্রচারমূলক কাজ শুরু করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস করে।যা বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইনত অধিকার প্রদান করে। এই আইনের মাধ্যমে বিধবাদের পুনর্বিবাহ বৈধতা পায় এবং তাদের সামাজিক ও আইনগত সুরক্ষা প্রদান করা হয়। তাঁর এই অবদান ভারতীয় সমাজে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থ রচনা

গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজস্ব স্বাধীন জীবিকা শুরু করেন এবং তিনি বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে পরিচিত হন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার যথার্থ শিল্পী। বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে **"**শকুন্তলা**"** ও **"**সীতার বনবাস**"** উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে **"**বেতাল পঞ্চবিংশতি**"** ও **"**ব্যাকরণ কৌমুদী**"** উল্লেখযোগ্য। তাঁর **"**আত্মজীবনী**"** খণ্ডিত হলেও এটি তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি। শিশুদের জন্য তিনি **"**বর্ণপরিচয়**",** **"**বোধোদয়**",** এবং **"**কথামালা**"** রচনা করেছেন।বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর লেখা বইগুলো শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি**,** বরং সমাজের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর লেখনী শক্তি ও গভীর জ্ঞান তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

উপসংহার

কালের নিয়মে এই মহামানবের প্রাণশক্তি ফুরিয়ে এলো। অবশেষে ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই তিনি চিরবিদায় নিলেন। বাঙালি জাতি হারালো তার সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান। বিদ্যাসাগরের অবদান আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছে**,** তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।। তাঁর কীর্তিচিহ্ন ‘বিদ্যাসাগর কলেজ’ আজও তাঁর স্মৃতিবহন করে চলেছে।